

শিশুবান্ধব পঞ্চায়েতের দাবিতে শিশু ইস্তাহার

গত ১২ এপ্রিল, ২০১৮ কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে শিশুবান্ধব পঞ্চায়েতের দাবিতে শিশু ইস্তাহার প্রকাশ করা হল। সাংবাদিক সম্মেলনে ওয়েবের রাজ্য আহ্বায়ক স্বপন পণ্ডা জানান, আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন উপলক্ষ্যে মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত মোট ৬টি জেলায় ১৯৪ জন শিশুর

সাথে আলোচনার মাধ্যমে তাদের মতামত সংগ্রহ করে এই শিশু ইস্তাহার তৈরি করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, এই ইস্তাহার সব রাজনৈতিক দল ও নির্বাচন প্রার্থীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সমর বাগচী মুখস্থ বিদ্যা কেন্দ্রিক শিক্ষার বিরোধিতা করে বলেন, কাজের মাধ্যমে, পরীক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে শিক্ষার প্রয়োজন। ক্রাই - চাইল্ড রাইটস অ্যান্ড ইউ-র পক্ষে আঞ্চলিক

অধিকর্তা অতীন্দ্রনাথ দাস শিশুদের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজকর্মী মানবেন্দ্রনাথ মণ্ডল। তিনি শিশু সুরক্ষার ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতের ভূমিকার ওপর আলোকপাত করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ২জন শিশু প্রতিনিধি আকাশ ভৌমিক ও অজয় দাস সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তাদের সমস্যার কথা ও দাবিগুলি তুলে ধরেন। শিশুরা এই ইস্তাহারে

সমসঙ্গ

জানুয়ারি-জুন ২০১৮

ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক-এর মুখপত্র



আমাদের লক্ষ্য : শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এমন এক সমাজ গড়ে

তোলা যেখানে শিক্ষা সামাজিক ন্যায় ও সাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত



যে যে দাবি তুলে ধরেছেন তা নিম্নরূপ:-

- স্কুল যাবার রাস্তা যেন ভাল এবং নিরাপদ হয়
- পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন স্কুল
- আবর্জনা ফেলার জন্য নির্দিষ্ট জায়গা রাখতে হবে
- পরীক্ষার সময় যেন মাইক না বাজে
- সব জায়গায় গাছ লাগানো থাকবে
- বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে হবে
- বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ চাই
- বিদ্যালয়ে ভাল জল চাই
- বিদ্যালয়ে পঠনপাঠন যেন আনন্দদায়ক হয়
- মিড-ডে মিলের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে

এবং গুণমান ভাল করতে হবে

- বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা সুনিশ্চিত করতে হবে
- বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে হবে
- বিপদসংকুল রাস্তায় বিদ্যালয়ে যাবার জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা থাকবে
- গ্রামে খেলার মাঠসহ শিশু উদ্যান থাকবে
- গ্রামে গ্রন্থাগার চাই
- গ্রামের ৩ থেকে ১৮ বছরের সব শিশু যেন লেখা-পড়া শেখে
- ছেলে-মেয়ে আলাদা চোখে যেন দেখা না হয়
- কেউ যেন শিশুশ্রমিক না হয়

- গ্রামস্তরের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডাক্তার চাই
- বাচ্চাদের চারপাশে যেন কেউ ধূমপান না করে
- স্কুলে বাচ্চাদের পুষ্টিকর খাবার যেন দেওয়া হয়
- গ্রামের উৎসবে যেন শিশুদের সুরক্ষার ব্যবস্থা থাকে
- শিশুদের কথা শোনার সুযোগ পঞ্চায়েতে থাকবে
- সব গ্রামে শিশু সুরক্ষা কমিটিকে সক্রিয় করতে হবে
- পঞ্চায়েতের বার্ষিক পরিকল্পনায় শিশুদের জন্য

শেষাংশ ২ পাতায় ...



শিশু ইস্তাহার প্রকাশ উপলক্ষ্যে সাংবাদিক সম্মেলনে শিশু প্রতিনিধিদের পাশে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ



কলকাতা প্রেস ক্লাবে শিশু ইস্তাহার প্রকাশ

৬ থেকে ১৪ বছরের সমস্ত শিশুর উপযুক্ত স্থান হল বিদ্যালয়

আক্ৰান্ত শৈশব ও আমাদের দায়িত্ব

শৈশবের নির্মল আনন্দ হারিয়ে যেতে বসেছে। ভাল করে কথা বলতে শেখার আগেই মায়ের কোল থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিদ্যালয়ের প্রাচীরের মধ্যে আটকে দেওয়া হচ্ছে। সামাজিক বাস্তবতার কথা বলে অভিভাবকরাও সব শিশুকেই সব বিষয়ে দক্ষতার শিখরে পৌঁছে দিতে এক অমানবিক দৌড় প্রতিযোগিতায় নাম লিখিয়ে দৌড়ছেন। ঘুম চোখে শিশু টলমল পায়ে হাঁটছে, মা-বাবার তাড়া ঠিক সময়ে স্কুলে পৌঁছাতে হবে। বাড়ি ফিরে ‘হোম টাস্ক’। তারপর সাঁতার, নাচ, গান, ছবি আঁকা আরও কত কী? শিশু খেলবে কখন? কেন? একা একাই ভিডিও গেম, মোবাইলে গেম খেলা যায় তো। কত রকমের খেলা। শিশু হাত পা ছুঁড়ে খেলবে তেমন মাঠ কই? মাঠ থাকলেও শিশুর সময় কই?

বিপরীত চিত্রও আছে। বহু শিশু এখনও বিদ্যালয়ের বাইরে। যারা লেখাপড়ার সুযোগ পায়না। শৈশবেই জীবন সংগ্রামে নেমে যেতে হয় পেটের জন্য, পরিবারের জন্য।

শিশু শ্রমিক, শিশু বিবাহ, শিশু পাচার, শিশু নির্যাতনের ঘটনার কোনও বিরাম নেই। শিশুর ওপর যৌন নির্যাতনের ঘটনা দিনের পর দিন যেভাবে সংবাদপত্রের পাতায় প্রকাশিত হচ্ছে তাতে মানুষ হিসেবে প্রশ্ন উঠবে সভ্যতা কোন দিকে এগোচ্ছে? শিশুরা একদিকে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে আবার কখনও কখনও কোনও কোনও শিশু নিজেও অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ছে। সামাজিক পরিবেশ শিশুর নৈতিক ও মূল্যবোধ বিকাশের পরিবর্তে শিশুকে অপরাধ করতে শেখাচ্ছে।

পৃথিবীকে শিশুর বাসযোগ্য করে তোলার পরিবর্তে এই বৈষম্যমূলক, হিংসায় আক্ৰান্ত সমাজে আমরা যেন শিশুকেই এই পৃথিবীর উপযুক্ত করে গড়ে তোলার এক নির্মম প্রতিযোগিতায় নেমেছি।

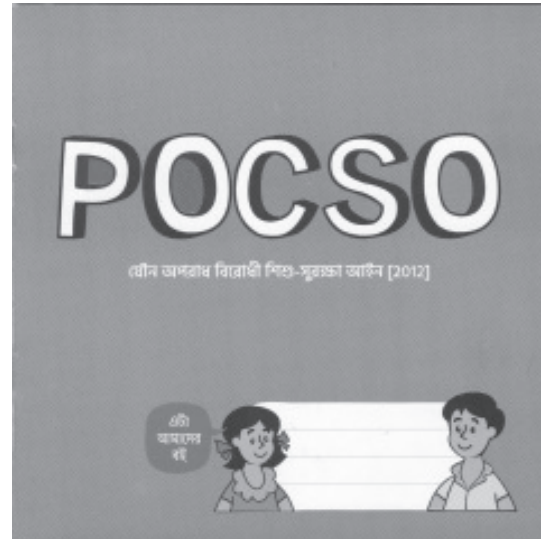
একদিকে পরিবেশ ধ্বংস অন্যদিকে সামাজিক সম্পর্ক নষ্ট করে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কোন পৃথিবী রেখে যাব? ভেবে দেখার সময় এসেছে শিশুদের জন্য একটা সুন্দর পৃথিবী গড়ে তুলতে আমাদের প্রচলিত জীবন যাপন ও ভাবনা কতটা যুক্তিযুক্ত? শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের জন্য আমাদের কী করা উচিত তা নিয়ে সমাজ যত আলোড়িত হবে, বিতর্ক হবে, মানুষ নতুন করে ভাববে ততই আমরা সুস্থ সমাজ ও শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের জন্য একটা নতুন পৃথিবী গড়ে তুলতে পারব।

ছড়ায় ছড়ায় শিশুদের সুরক্ষায় বার্তা

পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ ও জবালা অ্যাকশন রিসার্চ অর্গানাইজেশন যৌথভাবে প্রকাশ করেছে ‘চৈচিয়ে পাড়া মাত করো’। শিশুদের যৌন নিগ্রহের প্রতিরোধ করতে শিশুদের সচেতন করতে ১৬ বছর আগে জবালা এই ছড়ার বই প্রকাশ করেছিল। ছড়ার মাধ্যমে শিশুদের সহজ কথায় বোঝানো হয়েছে নিজেদের সুরক্ষায় কেন সচেতন থাকা প্রয়োজন, কাদের থেকে সচেতন থাকা প্রয়োজন, কী করতে হবে। সবই বোঝানো হয়েছে সুন্দরভাবে। আজও ঘরে বাইরে শিশুদের ওপর যৌন নির্যাতনের ঘটনা ঘটেই চলেছে। পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ সময়ের দাবি মেনে এই পুস্তিকাটি নতুন করে প্রকাশ করেছে। ছড়া ছাড়াও শেষ পৃষ্ঠায় ‘নিজেদের রক্ষা করতে শেখো’ এই শিরোনামে বেশ কিছু প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, যা শিশুদের সুরক্ষায় সচেতন করতে সহায়তা করবে।



যৌন অপরাধ বিরোধী শিশু সুরক্ষা আইন নিয়ে শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের বই



শিশুদের ওপর যৌন নির্যাতন বেড়েই চলেছে। সংবাদপত্রের পাতায় এই খবর দেখে যে কোনও সুস্থ মানুষ আতঙ্কিত বোধ করবেন, এটাই স্বাভাবিক। শিশুর ওপর যৌন নির্যাতন প্রতিরোধে আইন আছে, কিন্তু সে বিষয়ে সচেতনতা এবং আইন যথাযথভাবে কার্যকর করার অভাব রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ সহজ ভাষায় ছবি সহযোগে একটি সুন্দর বই প্রকাশ করেছে। শিশু থেকে অভিভাবক এই ধরনের ঘটনা ঘটলে কী করতে হবে তা ছবি ও লেখায় বলা হয়েছে, তেমনই কারা সুরক্ষা দেবে এবং কেমনভাবে দেবে সেই বিষয়েও স্বল্প কথায় আলোচনা করা হয়েছে। পুলিশ, বিশেষ পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট, বিশেষ আদালত কেমনভাবে শিশুবান্ধব পরিবেশে শিশুকে সুরক্ষা দেবে সেই আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান সময়ে শিশুদের সুরক্ষার জন্য এই প্রকাশনাটির গুরুত্ব অপরিসীম।

শিশুবান্ধব পদ্ধতিতে

১ পাতার শেষাংশ ...

- প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ করতে হবে
- প্রতিটি বিদ্যালয়ে শিশু সুরক্ষা নীতি বাস্তবায়িত করতে হবে
- এই শিশু ইস্তাহারে শিশুবান্ধব পদ্ধতিতে গঠনের জন্য ওয়েব বেসড এডুকেশন নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে কিছু প্রস্তাব রাখা হয়েছে। প্রস্তাবগুলি নিম্নরূপঃ
- শিশু অধিকারকে মানবাধিকার হিসেবে উপলব্ধি করা এবং অন্যদের মধ্যে সেই সচেতনতা বৃদ্ধি করা
- নিয়মিতভাবে গ্রামসভায় শিশুর অধিকারের বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা
- সব পদ্ধতিতে মিটিং-এ এবং গ্রামসভায় শিশু সুরক্ষার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা
- গ্রামে শিশু সুরক্ষা কমিটি গঠন ও তা কার্যকর করা

- প্রত্যেক পদ্ধতিতে সদস্যকেই সব সরকারি প্রকল্প সম্পর্কে জানতে হবে যাতে প্রয়োজন হলে শিশু এবং তার পরিবারকে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের মাধ্যমে সাহায্য করা সম্ভব হয়।
- নিজের কেন্দ্রের শিশুদের সুরক্ষার প্রয়োজনে যাঁদের সাথে যোগাযোগ রেখে চলা প্রয়োজন তাঁরা হলেন পুলিশ, পদ্ধতিতে সচিব, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, সমুদয় উন্নয়ন আধিকারিক অথবা সমুদয় উন্নয়ন এবং পদ্ধতিতে আধিকারিক, জেলা শাসক, চাইল্ড লাইন (১০৯৮)।
- শিশু সুরক্ষার ক্ষেত্রে পদ্ধতিতে ভূমিকার মূল্যায়ন করতে সামাজিক নিরীক্ষার ব্যবস্থা এবং রিপোর্ট প্রকাশ করা।

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে সংলাপ, প্রাজক, দীক্ষা-র মতো শিশু অধিকার সুরক্ষায় নিয়োজিত বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন।

জেলায় জেলায় শিশু সম্মেলন

রাজ্য পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে শিশুদের দাবি নিয়ে শিশু ইস্তাহার গঠনের লক্ষ্যে ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে বিভিন্ন জেলায় শিশু সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত ৬টি জেলায় ১৯৪ জন শিশুর সাথে আলোচনার মাধ্যমে তাদের মতামত সংগ্রহ করা হয়। পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুর, বর্ধমান - এই ৬টি জেলার শিশুরা তাদের যে মতামত ও দাবি তুলে ধরে তার ভিত্তিতেই শিশু ইস্তাহার তৈরি করা হয়। এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় একটি শিশু সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এই সম্মেলনেও ১২ জন শিশু প্রতিনিধি তাদের মতামত ও দাবি লিখে জানায়। শিশু সম্মেলনগুলিতে শিশুরা নিজেদের সমস্যার কথা ছাড়াও গ্রামের ও সমাজের নানা সমস্যার দিকে নজর দেওয়ার কথা বলে। শিশুদের দাবি সম্মিলিত এই শিশু ইস্তাহার নির্বাচনের আগে নির্বাচন প্রার্থীদের কাছে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়।



বর্ধমান জেলায় শিশু সম্মেলন



মুর্শিদাবাদ জেলায় শিশু সম্মেলন



উত্তর দিনাজপুর জেলায় শিশু সম্মেলন

নির্বাচন প্রার্থীদের সাথে শিশু ইস্তাহার নিয়ে ওকালতি



পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে শিশু ইস্তাহার নিয়ে নির্বাচন প্রার্থীদের সাথে ওকালতি



বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি গঠনের দাবিতে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান

শিক্ষা অধিকার আইন এবং এই আইন প্রয়োগের জন্য রাজ্য বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর যে রুল প্রকাশ করেছে তার ভিত্তিতে প্রতিটি বিদ্যালয়ে অভিভাবকদের প্রতিনিধি নিয়ে বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি গঠনের কথা। কিন্তু বাস্তবে আমাদের রাজ্যে আইন ও রাজ্য রুল মেনে এখনও পর্যন্ত কোনও বিদ্যালয়ে বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি গঠন করা হয়নি। আইন অনুযায়ী পরিচালন কমিটির ওপর দায়িত্ব বিদ্যালয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করার। বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি গঠন না হলে বিদ্যালয় উন্নয়ন পরিকল্পনা করাও সম্ভব হচ্ছে না। ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে তাই বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি গঠনের দাবিতে স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হচ্ছে। বিভিন্ন জেলায় অভিভাবকদের সাথে আলোচনা, বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি গঠনের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে প্রচারপত্র বিলি করার মাধ্যমে জন সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি গঠনের দাবিতে স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হচ্ছে। অভিভাবকদের দিক থেকে এই স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানে ভাল সাড়া পাওয়া যাচ্ছে।



বিদ্যালয় পরিচালন গঠনের দাবিতে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানে অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা

রাজ্য শিশু সুরক্ষা দিবস

গত ৯ জুন, ২০১৮ কলকাতার রবীন্দ্রসদনে পালিত হল রাজ্য শিশু সুরক্ষা দিবস। পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের উদ্যোগে আয়োজিত এই শিশু সুরক্ষা দিবস পালনের অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন শিশু বিকাশ এবং নারী উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) মাননীয় ডা. শশী পাঁজা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় সচিব শ্রীমতী সঞ্জয়মিত্রা ঘোষ। সমগ্র অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিশু সুরক্ষা আয়োগের চেয়ারপার্সন শ্রীমতী অনন্যা চক্রবর্তী। শিশু সুরক্ষা আয়োগের অন্যান্য সদস্যরাও এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন সংগঠনের শিশু শিল্পীরা নাচ, আবৃত্তি, নাটক, ক্যারারে প্রদর্শন, যোগ ব্যায়াম সহ নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। ‘পকসো’ – যৌন অপরাধ বিরোধী শিশু-সুরক্ষা আইন (২০১২) নামে একটি রঙ্গিন পুস্তিকা প্রকাশ করা হয় শিশু সুরক্ষা আয়োগের পক্ষে।



শিশু সুরক্ষা দিবস উদ্‌যাপন

বার্ষিক পর্যালোচনা ও পরিকল্পনা সভা

গত ৫ এবং ৬ জুন, ২০১৮ ক্রাই-এর কলকাতা কার্যালয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্কের বার্ষিক পর্যালোচনা ও পরিকল্পনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। ২০১৭-১৮ আর্থিক বছরের কাজের পর্যালোচনা এবং ২০১৮-১৯ আর্থিক বছরের কাজের পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে এই সভায় উপস্থিত ছিলেন ওয়েবেনের রাজ্য কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং ক্রাই-এর কলকাতা কার্যালয়ের প্রতিনিধিবৃন্দ। দু’দিনের এই সভায় বিগত বছরের সাফল্য এবং ব্যর্থতা নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি ইতিবাচক অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করা হয়। ২০১৮-১৯ আর্থিক বছরের পরিকল্পনায় বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি গঠন, বিদ্যালয়ে শিশু সুরক্ষা কমিটি, কার্যকরী গ্রামস্তরীয় শিশু সুরক্ষা কমিটি সহ শিশু সুরক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। সভায় রাজ্য আহ্বায়ক স্বপন পণ্ডা, প্রাক্তন রাজ্য আহ্বায়ক দিপালী নন্দী, ক্রাই-এর পক্ষে সুশান্ত চক্রবর্তী, অসীম ঘোষ, প্রতীক ব্যানার্জী সহ ওয়েবেনের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যরা তাদের মতামত দেন।

রাইট টু এডুকেশন ফোরামের সভা

গত ২৮ জুন, ২০১৮ অল বেঙ্গল উইমেন্স ইউনিয়ন-এর সভাকক্ষে ওয়েস্ট বেঙ্গল রাইট টু এডুকেশন ফোরামের পক্ষ থেকে একটি সভার আয়োজন করা হয়। সভার শুরুতে আলোচ্যসূচি ঠিক করার পর আশিস কুমার রায় দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল রাইট টু এডুকেশন ফোরামের সভার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি ‘সমগ্র শিক্ষা অভিযান’ বিষয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় শিক্ষা অধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সকলের মতামত গ্রহণ করে ফোরামের অবস্থান ঠিক করা প্রয়োজন। এছাড়াও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় আগামী অগস্ট মাসে ন্যাশনাল রাইট টু এডুকেশন ফোরামের জাতীয় আহ্বায়ক অম্বরীশ রাই-এর সঙ্গে কলকাতায় ওয়েস্ট বেঙ্গল রাইট টু এডুকেশন ফোরামের একটি সভার আয়োজন করা হবে। এছাড়াও ফোরামের বিভিন্ন কর্মসূচির জন্য সময় নির্ধারণ করা হয়। ফোরামের পরবর্তী সভা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২৫ জুলাই, ২০১৮।

শিক্ষার মান, পুষ্টি কিছু সমস্যা

তপন কুমার দাস

লোকসভা ও রাজ্যের বিধানসভায় নতুন বাজেট পেশ হয়েছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বাজেট পেশের সময় বলেন, ‘আমরা পড়ুয়াদের স্কুলে নিয়ে আসতে পারলেও এখনও পর্যন্ত শিক্ষার মান দুশ্চিন্তার কারণ।’ এজন্য প্রাক-প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত কোনও স্তর ভাগ না করেই শিক্ষার মান উন্নয়নের ব্যবস্থা হচ্ছে (সূত্র: আনন্দবাজার, ২ ফেব্রুয়ারি)। অনেকেই অবশ্য বলছেন মান উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে আসলে পাশ-ফেল ব্যবস্থা ফেরানোর দিকে ইঙ্গিত দিচ্ছেন অরুণ জেটলি। তবে কিছুটা হলেও সুরাহা করা গিয়েছে স্কুলছুট সমস্যার।

ওই প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, অর্থমন্ত্রী জানান, বিশেষভাবে নজর দেওয়া হচ্ছে উপজাতিদের শিক্ষা উন্নয়নে। যে সব ব্লকে ৫০ শতাংশের বেশি তফশিলী উপজাতির মানুষ আছেন এবং যে সব ব্লকে অন্তত ২০ হাজার সাধারণ উপজাতির মানুষ বসবাস করেন, সেখানেই ‘একলব্য রেসিডেন্সিয়াল স্কুল’ গড়ে তোলা হবে। এই প্রকল্প সম্পূর্ণ করার সময়সীমা ধার্য করা হয়েছে ২০২২ সাল। ওই স্কুলগুলি হবে নবোদয় বিদ্যালয়ের মতোই। সেখানে স্থানীয় সংস্কৃতি আর শিল্পকলা সংরক্ষণেরও বন্দোবস্ত হবে। নানা ধরনের খেলা ও নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দেওয়া হবে প্রশিক্ষণ। পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, পুরুলিয়া-সহ বিভিন্ন জেলায় একলব্য স্কুল রয়েছে।

কেন্দ্রীয় বাজেটে শেষবার মিড-ডে মিল প্রকল্পে বরাদ্দ সামান্য বাড়ানো হয়েছিল ২০১৫-২০১৬ আর্থিক বছরে। তার পরে দু-দুটি অর্থবর্ষে বরাদ্দ বাড়েনি। এবারের বাজেটেও স্কুলে দুপুরের খাবার নিয়ে টুঁ শব্দটি করেননি অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। মাগ্নিগন্ডার বাজারে স্কুলপড়ুয়াদের খাবার জোগানোর প্রকল্পে একটি পয়সাও না-বাড়ানোর রাজ্যের শিক্ষাকর্তারা একই সঙ্গে ক্ষুব্ধ ও চিন্তিত (সূত্র : আনন্দবাজার, ২ ফেব্রুয়ারি)।

সংবাদ সূত্রে জানা যায়, রাজ্যের ক্ষোভ নানা দিক থেকে। বিশেষত গ্রামাঞ্চলে ঢালাও সুবিধা দেওয়া সত্ত্বেও মিড-ডে মিলের পাতে কিছুই পড়ল না কেন? চিন্তা: দুর্মূল্যের বাজারে সামান্য বরাদ্দে বাচ্চাদের মুখে খাবার দেওয়া যাবে কীভাবে? স্থায়ী নির্দেশ রয়েছে। সপ্তাহে দু’দিন মিড-ডে মিলের থালায় ডিম থাকতেই হবে। ‘ভেজ প্রোটিন’ বা উত্তিজ প্রোটিন দিতে হবে রোজ। সঙ্গে ভাত-ডাল-তরকারি। কিন্তু এত কিছুর জন্য বরাদ্দ মোট ৪.১৩ টাকা শিক্ষার্থী-পিছু।

সংবাদে প্রকাশ, এই সামান্য টাকায় ফিরিস্তি মিলিয়ে স্কুলে মিড-ডে মিল দিতে গিয়ে মাথায় হাত পড়েছে রাজ্যের সর্বশিক্ষা মিশনের কর্তাদের। সর্বশিক্ষা মিশনের কর্তাদের আশা ছিল মিড-ডে মিলের বরাদ্দ বাড়বে। তাই স্বাভাবিক, দপ্তরের ক্ষোভ থাকতেই পারে।

স্কুলশিক্ষা দপ্তর থেকে জানা যায়, ২০০১ সালে প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে দুপুরের খাবার দেওয়া প্রকল্প চালু হয়। মূলত স্কুলছুট কমাতেই কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রকল্প হাতে নিয়েছিল। ২০০১ সালে সর্বশিক্ষা মিশনের অধীনে এই উদ্যোগ শুরু হলেও তা সারা দেশে চালু হয় ২০০৪ সালে, ইউপিএ সরকারের আমলে। তারপর ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষ পর্যন্ত প্রতি বছর মিড-ডে মিল প্রকল্পে বরাদ্দ বেড়েছে ৭ শতাংশ হারে। ২০১৫-১৬ আর্থিক বছরে বরাদ্দ সামান্য বাড়ানো হয়। তারপর থেকে আর বাড়েনি। সংবাদে প্রকাশ, স্কুলশিক্ষা দপ্তরের এক কর্তা জানান, ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষের বরাদ্দ অর্থই পাঠায়নি কেন্দ্র।

এখন প্রাথমিকে মিড-ডে মিলের জন্য পড়ুয়া-পিছু বরাদ্দ ৪.১৩ টাকা। উচ্চ প্রাথমিকে ৬.১৮ টাকা। এই মিড-ডে মিল খাতে বরাদ্দ অর্থের ৬০ শতাংশ দেয় কেন্দ্র, বাকি ৪০ শতাংশ রাজ্য। তবে পড়ুয়া-পিছু কত বরাদ্দ হবে তা ঠিক করে কেন্দ্র। কিন্তু গত দু’টি আর্থিক বছরে একটি টাকাও বাড়ায়নি তারা। এবারে মিড-ডে মিল খাতে বরাদ্দ না বাড়ায় স্কুলশিক্ষা দপ্তরের দুশ্চিন্তা বেড়েছে। কারণ বাজার আগুন। এক এক সময় ডিমের দাম অনেক বেড়ে যায়। তাই ওই বরাদ্দ টাকায় কীভাবে সপ্তাহে দু’দিন ডিম দেওয়া যাবে তার চিন্তা কে করে? বছরে ১২টি গ্যাসের সিলিন্ডারে ভর্তুকি পাওয়া যায়। কিন্তু যাদের বছরে ২৫/৩০টি সিলিন্ডার লাগে তাদের খরচ সামলাবে কে?

এদিকে আবার প্রতিদিন কতজন মিড-ডে মিল খাচ্ছে তা এসএমএস করে পাঠাতে হবে। কারচুপি ধরা পড়লে সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের মানহানি

করতেও দ্বিধা করা যাবে না। একটা সাধারণ উদাহরণ দিলে ছবিটি পরিষ্কার হবে। ধরা যাক একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৮০, সকলে মিড-ডে মিল খেলে ৮৫ শতাংশ অর্থাৎ ১৫৩ জন শিক্ষার্থীর জন্য অর্থ বরাদ্দ হবে। এখন ১৫৩ জনের জন্য যে জ্বালানি লাগে ১০০ জনের রান্নার জন্য প্রায় একই জ্বালানি খরচ হয়। এখন ওই বিদ্যালয়ে যদি ১০০ জন পড়ুয়া মিড-ডে মিল খায় তাহলে এসএমএস করে ১০০ জনের হিসাব দিতে হবে। বিদ্যালয়ে ওই রান্নার জন্য সপ্তাহে একটি সিলিন্ডার ধরলে সারা মাসে (যদি অন্য ছুটি না থাকে) ৪টি গ্যাস সিলিন্ডার লাগবে। গ্যাস সিলিন্ডারের মূল্য এ মাসে ৭৬০ টাকা, বহন খরচ ৪০ টাকা, ২ কপি চেকবই পাতার জেরক্স ২ x ২ = ৪ টাকা অর্থাৎ ৮০৪ টাকা পড়বে। ৪টি সিলিন্ডারে ৮০৪ x ৪ = ৩২১৬ টাকা শুধু জ্বালানি খরচ হয়। সপ্তাহে ২টি ডিম হলে মাসে (৫.৫০ x ৮০০) = ৪,৪০০ টাকা লাগবে। সঃ তেল (1st মার্ক সিল করা) প্রতিদিন ২৫০ গ্রাম ধরলে ২৪ দিনে লাগবে ৬ কিলোগ্রাম। দাম পড়বে ৬০০ টাকা। মুসুর ডাল গড়ে দৈনিক ১.৫০০ কিলোগ্রাম ধরলে ২৪ দিনে খরচ হবে ৩৬০০ টাকা। এবার লক্ষ্য, হলুদ, আদা, রসুন, পেঁয়াজ ও অন্যান্য সবজি মিলে দিনে গড়ে ১০০ টাকা ধরলে খরচ হয় ২৪০০ টাকা। তাহলে ১০০ জন শিক্ষার্থীর রান্নার জন্য মোট খরচ হয় = ৩,২১৬ (জ্বালানি) + ৪,৪০০ (ডিম) + ৬০০ (সঃ তেল) + ৩,৬০০ (ডাল) + ২,৪০০ (মশলা+সবজি) = ১৪,২১৬ টাকা। সরকারের কাছ থেকে পাওয়া যায় ২৪ x ১০০ x ৪.১৩ = ৯,৯১২ টাকা। তাহলে মাসে (১৪,২১৬-৯,৯১২) = ৪,২৯৮ টাকা ঘাটতি কে জোগাবে? সুতরাং একটাই রাস্তা, শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়িয়ে দেখাতেই হবে। এর ওপর রান্নার লোকেদের জন্য আলাদা খাদ্যসামগ্রীও দিতে হয়। এই কাজ করতে শিক্ষকদের শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়িয়ে দেখানো ছাড়া উপায় নেই। আর যেহেতু মিড-ডে মিলের অর্থ প্রধান শিক্ষকের নামে আসে তাই দায়ভার তাঁরই। কোনও কিছুর বিচ্যুতি ঘটলে তাঁকেই শাস্তি পেতে হয়। আর এই সুযোগে অনেক ফাঁকিবাজ শিক্ষক সুবিধা আদায় করে নেন। যেমন দেরিতে আসা, তাড়াতাড়ি চলে যাওয়া, ক্লাস ঠিকমতো না নেওয়া, এখানে প্রধান শিক্ষক কোনওভাবেই কড়া হতে পারবেন না। কারণ মিড-ডে মিলের হিসাব বাড়িয়ে দেন তিনি। তাই শাস্তির খাঁড়া ঝোলে তাঁর ওপর। অন্যায় দেখেও সহ্য করতে হয় সবই।

এখন সরকারি বিদ্যালয়ে না পড়ালে শিক্ষকদের কোনও শাস্তি হয় না, কিন্তু মিড-ডে মিল প্রতিদিন না হলে প্রধান শিক্ষককে কাঠগড়ায় উঠতে হয়। এখানে শিক্ষা গৌণ, দ্বিপ্রাহরিক আহার মুখ্য। তাই যা হবার তাই হচ্ছে, শিক্ষার মান তলানিতে নামছে। মিড-ডে মিল রান্নার জন্য দোকান, বাজার, জ্বালানির হিসাব করতে গিয়ে, রাঁধুনি ও অভিভাবকদের মন জুগিয়ে চলতে গিয়ে শিক্ষকরা বিশেষ করে প্রধান শিক্ষক টেনশনে ভোগেন। তার উপর খাদ্যে কোনওরকম বিষক্রিয়া ঘটলে প্রধান শিক্ষকের জেল-জরিমানা।

এবার আসা যাক সরকারি নানা নির্দেশনায় পঠন পাঠনের কাজ ফেলে শিক্ষকরা সেই তথ্য জোগাড় করতে ব্যস্ত হন। নির্দেশিত তথ্যগুলি জোগাড় করার সময়ও খুব কম দেওয়া হয়। এও একটা বিশাল সমস্যা। আবার শিক্ষার্থীদের বড়ি (আয়রন) খাওয়ানো ও তার তথ্য পাঠানো সেও এক সমস্যা। শিক্ষার্থীদের শরীর খারাপ হলে সমস্ত দায়িত্ব বিদ্যালয়েই এসে পড়ে। সে ঝামেলাও মেটাতে হয় শিক্ষকদের।

এরপর আছে শিক্ষকদের ছুটি নেওয়ার ব্যপার। আগের ছুটির সংখ্যার সাথে যোগ হয়েছে ‘চাইল্ড কেয়ার লিভ’। এখানে শিক্ষিকারা বছরে বাড়তি ৪৫ দিন ছুটি পাচ্ছেন। এমনিতে স্কুলে এসে বাড়ির নানা সমস্যায় শিক্ষিকাদের একটু বেশিই ছেড়ে দিতে হয়। তাহলে ৫২টি রবিবার, ১৪টি সি এল, ৬৫টি তালিকাভুক্ত ছুটি, মেটানিটি লিভ, চাইল্ড কেয়ার লিভ, মেডিকেল লিভ, ব্যক্তিগত ছুটি মিলিয়ে ছুটি ভোগ করলে কতদিন কাজ করেন? তাই এখানে শিক্ষার মান উন্নয়ন কীভাবে সম্ভব! আবার সব স্কুলে শ্রেণি বা শিক্ষার্থী অনুপাতে শিক্ষক নেই। তাই রাজ্য সরকার পোষিত বিদ্যালয়ের আর বেশি কিছু আশা করা সম্ভব নয় — যতটুকু হচ্ছে ততটুকুই মেনে নিতে হবে। সেদিন এক প্রথম শ্রেণির দৈনিকে কোনও এক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকাকে শিক্ষাদপ্তরের কোনও আধিকারিক কোনও কাজ করেন না বললে তিনি জানান, কাজ কি করবো, শিক্ষিকাদের চাইল্ড কেয়ার লিভ অনুমোদন করার ঝগড়া থামাবো না পড়াশুনায় মনোযোগ দেওয়াবো। সত্যিই আজ কারণে অকারণে সি সি এল পাইয়ে দেওয়ার যে সুবিধা দেওয়া হয়েছে তাতে পড়াশুনার চরম ক্ষতি হতে বাধ্য। একজন

শেষাংশ ৮ পাতায় ...

শিশুর বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতন প্রতিরোধে আইন দ্য প্রটেকশন অফ চিলড্রেন ফ্রম সেক্সুয়াল অফেন্সেস (POCSO) অ্যাক্ট, ২০১২

সম্প্রতি আমাদের রাজ্যে একটি বেসরকারি বিদ্যালয়ে এক চার বছরের শিশুর বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের অভিযোগকে ঘিরে সংবাদমাধ্যমে হইচই হয়েছে। আলোচনার সূত্রে জানা গেল শিশুর বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতন বিরোধী যে আইন রয়েছে তা সাধারণ মানুষ তো বটেই, এমনকি যাঁরা শিশুদের প্রতিষ্ঠান চালান তাঁদের অনেকের কাছেও এই আইন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা নেই। অথচ শিশুর বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতন কোনও নতুন ঘটনা নয়। আমাদের দেশের মহিলা ও শিশু বিকাশ মন্ত্রক ২০০৭ সালে একটি সমীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করেছিল। মোট ১৩টি রাজ্যের ১২৫০০ শিশু এই সমীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিশুদের মধ্যে ৫৬ শতাংশ শিশুই জানিয়েছে তাঁরা এক বা একাধিকভাবে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এর মধ্যে ২০ শতাংশের বেশি শিশু জানিয়েছে তাঁরা খুবই নৃশংসভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছে। যে সকল শিশু নির্যাতনের শিকার হয়েছে তাঁদের মধ্যে ৫৭ শতাংশই ছেলে। যদিও সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক অথবা শিক্ষাগত ভেদাভেদ ব্যতিরেকেই সব শিশুরই নির্যাতনের ঝুঁকি থেকে যায়, তবুও কিছু শিশুর একটু বেশি ঝুঁকি থাকে যেমন প্রতিবন্ধকতায়ুক্ত বা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু, সামাজিক বা আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া বর্গের শিশু, যে শিশুর আত্মপ্রতীতি কম, বিচ্ছিন্ন শিশু বা বন্ধুবান্ধব কম এমন শিশু। ভারত সরকার ‘দ্য প্রটেকশন অফ চিলড্রেন ফ্রম সেক্সুয়াল অফেন্সেস অ্যাক্ট, ২০১২ কার্যকর করেছে শিশুদের যৌন নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করতে, বিচার প্রক্রিয়ার প্রতিটি পর্বে শিশুর স্বার্থ সুরক্ষা করতে। শিশুবান্ধব পদ্ধতিতে রিপোর্ট, প্রমাণ রেকর্ড করা, তদন্ত এবং বিশেষ আদালতে দ্রুত বিচার এই আইনের উদ্দেশ্য।

এই আইন অপরাধের একটি সুসংহত সংজ্ঞা দিয়েছে যা শিশুর বিরুদ্ধে সম্ভাব্য সব রকমের যৌন অপরাধ এবং যৌন শোষণের বিষয়গুলিকেই চিহ্নিত করেছে। এই আইন অনুযায়ী ১৮ বছরের নীচে সব ব্যক্তিই শিশু। এই আইনটি লিঙ্গ নিরপেক্ষ।

এই আইন অনুযায়ী কোনও শিশুর বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতন ঘটলে শিশুর সুরক্ষার স্বার্থে যে পদ্ধতিতে বিচার প্রক্রিয়া চলবে তা নিম্নরূপ :-

শিশুর যৌন নির্যাতন

স্থানীয় পুলিশ / এস জে পি
ইউ কে ঘটনা সম্পর্কে
রিপোর্ট করা

এস জে পি ইউ / পুলিশের
দ্বারা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে
বিবৃতি রেকর্ড করা

- শিশুকে সেন্টার হোম / হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া {ধারা ১৯ (৫)}
- শিশুকে মহিলা ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া {ধারা ২৭ (২),
রুল, ৫}
- ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা বিবৃতি রেকর্ডিং (ধারা ২৫)
- শিশু কল্যাণ সমিতি কর্তৃক ৩ দিনের মধ্যে শিশু কোথায় থাকবে তা স্থির
করা, যদি পুলিশ/এস জে পি ইউ-র রিপোর্ট থেকে বোঝা যায় যে শিশুটির
যত্ন ও সুরক্ষার প্রয়োজন। {রুল ৪ (৪)} - পরিবার/অভিভাবক অথবা
উপযুক্ত ব্যক্তির কাছে, শিশু আবাস {রুল ৪ (৪)} অথবা আশ্রয় আবাস
{ধারা ১৯ (৫) এবং রুল ৪ (৪)}, কাউন্সেলিং (ধারা ৪০), সহায়ক
ব্যক্তি {রুল ৪(৭)}।
- বিশেষ আদালত (শিশু বান্ধব) কর্তৃক অপরাধ সংঘটিত হওয়ার এক
বছরের মধ্যে বিচার সম্পূর্ণ করা (ধারা ২৮ এবং ৩৩)। শিশুকে সহায়তার
জন্য দোভাষী/অনুবাদক/স্পেশাল এডুকেটরের ব্যবস্থা করা {ধারা ১৯(৪)}

এবং রুল ৩ (৭)}, অভিযুক্তের সামনা সামনি হওয়া থেকে শিশুকে
রক্ষার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা {ধারা ৩৩(৭) এবং ধারা ৩৬}, আক্রান্ত
শিশুর ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা (রুল ৭), বিশেষ সরকারি উকিল দ্বারা
মামলা (ধারা ৩২)

এই আইন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মূল কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব

কর্তৃপক্ষ

দায়িত্ব

পুলিশ/স্পেশাল জুভেনাইল
পুলিশ ইউনিট

- তথ্য রেকর্ড করা।
- প্রাথমিক তদন্ত পরিচালনা করা।
- ২৪ ঘণ্টার মধ্যে শিশু কল্যাণ সমিতি/বিশেষ
আদালতে ঘটনা সম্পর্কে জানানো।
- যদি প্রয়োজন হয় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে শিশু
কল্যাণ সমিতির কাছে শিশুটিকে হাজির করা।
- শিশুর চিকিৎসার ব্যবস্থা।
- বাবা-মা/অভিভাবককে সবারকম তথ্য
জানানো।
- ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিশেষ আদালতকে সহায়ক
ব্যক্তির নিয়োগ সম্পর্কে জানানো।
- শিশুটি যেন কোনও অবস্থাতেই অভিযুক্তের
সাক্ষাতে না আসে তা সুনিশ্চিত করা।

শিশু কল্যাণ সমিতি

- শিশুটি কোথায় থাকবে তা ৩ দিনের মধ্যে
স্থির করা, পরিবার/শিশু আবাস/আশ্রয়
আবাস - যদি দেখা যায় শিশুটির যত্ন ও
সুরক্ষার প্রয়োজন আছে।
- সহায়ক ব্যক্তির ব্যবস্থা করা।

জেলা শিশু সুরক্ষা ইউনিট

- দোভাষী/অনুবাদক/স্পেশাল এডুকেটর-এর
তালিকা রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং তা
কর্তৃপক্ষের কাছে জানানো।
- দোভাষী/অনুবাদকের পরিষেবার জন্য
পারিশ্রমিক বাবদ অর্থ প্রদান করা।

ম্যাজিস্ট্রেট

- শিশুর বাড়িতে অথবা শিশুর পছন্দ মতো
স্থানে/যেখানে শিশু স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে
সেখানে শিশুর বিবৃতি রেকর্ড করা।
- পুলিশের চূড়ান্ত রিপোর্টের একটি প্রতিলিপি
শিশু/বাবা-মা/প্রতিনিধিকে দেওয়া।

বিশেষ আদালত/বিচারক

- ক্যামেরা।
- শিশুবান্ধব পরিবেশ সুনিশ্চিত করা।
- শিশুর মর্যাদাকে শ্রদ্ধা জানানো।
- শিশুর পরিচয় গোপন রাখা।
- ৩০ দিনের মধ্যে শিশুর প্রমাণ রেকর্ড করা।
- এক বছরের মধ্যে বিচার সম্পূর্ণ করতে হবে।

স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর

- কেস পরিচালনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে এই
আইনের অনুসরণ করা।

সহায়ক ব্যক্তি

- গোপনীয়তা রক্ষা করা।
- বাবা-মা/অভিভাবককে সব তথ্য জানানো।
- বিচার প্রক্রিয়ায় শিশুর ভূমিকা সম্পর্কে জানানো।

রাজ্য সরকার

- একটি আদালতকে বিশেষ আদালত হিসেবে উন্নিত করা।
- একজন স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটরকে নিয়োগ করা।
- আইনটি জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা।
- সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- আইনটি প্রয়োগের জন্য নিয়মাবলী ও নির্দেশিকা তৈরি করা।

কেন্দ্রীয় সরকার

- আইনটির প্রচারের ব্যবস্থা করা
- সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- আইনটি প্রয়োগের জন্য নিয়মাবলী ও নির্দেশিকা তৈরি করা।

জাতীয় শিশু সুরক্ষা

আয়োগ / রাজ্য শিশু

সুরক্ষা আয়োগ

- আইনটি কার্যকর করার বিষয়ে দেখভাল করা।
- নির্দিষ্ট কেসের জন্য শিশু কল্যাণ সমিতির কাছ থেকে রিপোর্ট চেয়ে পাঠানো।
- বার্ষিক রিপোর্টে এই আইনটির প্রয়োগ বিষয়ক প্রতিবেদন একটি পৃথক অধ্যায়ে পেশ করা।

এই আইনের অধীন সকল সংগঠনকে শিশুবান্ধব প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে হবে
ধারা ১৯ - স্পেশাল জুভেনাইল পুলিশ / স্থানীয় পুলিশ এবং ম্যাজিস্ট্রেট

- শিশু সহ যে কোনও ব্যক্তি অপরাধের বিষয়ে স্পেশাল জুভেনাইল ইউনিট / স্থানীয় পুলিশের কাছে রিপোর্ট করতে পারেন।
- বিদ্যালয়, কলেজ, হাসপাতাল, হোটেল, ক্লাব, স্টুডিও, ফটোগ্রাফির সুবিধা আছে এমন প্রতিষ্ঠান এবং সংবাদমাধ্যম সহ সকল ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান এই আইন অনুযায়ী ঘটনা সম্পর্কে জানার সাথে সাথেই রিপোর্ট করতে দায়বদ্ধ (ধারা - ২০)।
- পুলিশ শিশুর বিবৃতি সরল ভাষায় রিপোর্ট করবে, যাতে শিশু বুঝতে পারে কী রেকর্ড করা হয়েছে এবং প্রয়োজন হলে অনুবাদক বা দোভাষীকে দেওয়া।
- স্পেশাল জুভেনাইল পুলিশ ইউনিট/স্থানীয় পুলিশ শিশুর যত্ন ও সুরক্ষার ব্যবস্থা করবে।
- শিশুটিকে যত দ্রুত সম্ভব নিকটবর্তী হাসপাতালে পরীক্ষার জন্য নিয়ে যেতে হবে এবং যদি প্রয়োজন হয় আশ্রয় আবাসে নিয়ে যেতে হবে।
- বিষয়টি ২৪ ঘন্টার মধ্যে শিশু কল্যাণ এবং বিশেষ আদালতকে জানাতে হবে {ধারা ১৯ (৬)}।
- শিশুটির বাড়িতে অথবা যেখানে শিশুটি অধিকাংশ সময় থাকে অথবা শিশুর পছন্দ মতো স্থানে একজন মহিলা সাব-ইন্সপেক্টর কর্তৃক শিশুটির বিবৃতি রেকর্ড করা উচিত। {ধারা ২৪ (১)}।
- যৌন নির্যাতনের শিকার শিশুটির সাথে পুলিশ অবশ্যই সাধারণ পোশাকে কথা বলবে {ধারা ২৪ (২)}।
- তদন্ত করার সময় পুলিশকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে শিশুটির যেন কোনও অবস্থাতেই অভিযুক্তের সাথে সাক্ষাৎ না হয় {ধারা ২৪ (৩)}।
- রাতের বেলায় শিশুটিকে থানায় রাখা যাবে না {ধারা ২৪ (৪)}।
- পুলিশ আধিকারিককে নিশ্চিত করতে হবে প্রচার মাধ্যমের কাছে শিশুটির পরিচয় গোপন থাকবে {ধারা ২৪ (৫)}।
- রুল ৪ (৩) অনুযায়ী পুলিশ শিশুটিকে শিশু কল্যাণ সমিতির কাছে নিয়ে যাবে।

মেডিক্যাল / আইন / গণমাধ্যম এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা

একজন মেয়ে শিশুর পরীক্ষা একজন মহিলা ডাক্তারই করতে পারবে অথবা চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্তৃক মনোনীত মহিলার সামনে {ধারা ২৭ (২)}। শিশুটি ও তাঁর পরিবার আইনি সহায়তা কর্তৃপক্ষের কাছে থেকে বিনা মূল্যে

আইনি পরিষেবা পাওয়ার অধিকারী (রুল ৪ এবং ধারা ৪০)।
গণমাধ্যমকে কঠোরভাবে পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

ধারা ৩৩ - বিশেষ আদালত

- আদালতে উপস্থিত করার সময় শিশুটির পরিবারের একজন সদস্য, একজন অভিভাবক, একজন বন্ধু অথবা একজন আত্মীয়কে থাকার অনুমতি দিয়ে শিশুবান্ধব পরিবেশ তৈরি করতে হবে। {ধারা ৩৩(৪)}। শিশু যেমন বলবে তেমন ভাবেই বিবৃতি রেকর্ড করতে হবে {ধারা ২৬ (১)}।
- শিশুটিকে যেন বারংবার ডাকা না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে {ধারা ৩৩ (৫)}।
- কোনও আক্রমণাত্মক প্রশ্ন বা চারিত্রিক বিষয়ে প্রশ্ন করা যাবে না এবং শিশুর মর্যাদা রক্ষা সুনিশ্চিত করতে হবে {ধারা ৩৩ (৬)}।
- শিশুর পরিচয় যেন প্রকাশ না হয় তা সুনিশ্চিত করতে হবে {ধারা ৩৩ (৭)}।
- শিশুর মানসিক এবং শারীরিক প্রতিবন্ধকতা থাকলে বিশেষ শিক্ষকের ব্যবস্থা {ধারা ২৬ (৩)}।
- বিবৃতি দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যমে (ভিডিও কনফারেন্সিং) রেকর্ড করা যেতে পারে {ধারা ২৬(৪)}।
- ক্যামেরার মাধ্যমে বিচার বাধ্যতামূলক অর্থাৎ কেবলমাত্র কেসের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরই আদালত কক্ষে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে {ধারা ৩৭}।
- শিশুটির সাক্ষ্য-প্রমাণ ৩০ দিনের মধ্যে রেকর্ড করতে হবে শিশুটির বাবা-মার সামনে অথবা শিশুটির আস্থা আছে এমন ব্যক্তির উপস্থিতিতে।
- বিচার প্রক্রিয়া যতটা সম্ভব এক বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ করতে হবে {ধারা ৩৫ (২)}।
- কেস অমীমাংসিত থাকা অবস্থায় নির্যাতিত শিশুটির জন্য অন্তর্বর্তীকালীন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।
- যদি যৌন নির্যাতনের ঘটনাটি কোনও ১৮ বছরের কম বয়সী ব্যক্তির দ্বারা (ঘটনার সময়ে) ঘটে থাকে তবে জুভেনাইল জাস্টিস (কেয়ার অ্যান্ড প্রটেকশন অফ চিলড্রেন) অ্যাক্ট, ২০১৫ প্রয়োগ করা হবে {ধারা ৩৪}।
- পরীক্ষার সময় যেন শিশুটি অভিযুক্তকে দেখতে না পায় তা নিশ্চিত করতে হবে {ধারা ৩৬}।
- বিচার প্রক্রিয়ার শুরুতে এবং বিচার প্রক্রিয়ার সময় শিশুর সাক্ষ্য-প্রমাণ রেকর্ড করতে শিশুটিকে সহায়তার জন্য বিশেষজ্ঞের পরিষেবা নেওয়া যেতে পারে {ধারা ৩৮}।

জুভেনাইল জাস্টিস (কেয়ার অ্যান্ড প্রটেকশন অফ চিলড্রেন) অ্যাক্ট, ২০১৫ এবং পকসো অ্যাক্ট, ২০১৫-এর মধ্য সংযোগ

এক) পকসো অ্যাক্টের অধীন নির্যাতিত শিশুর যত্ন ও সুরক্ষার প্রয়োজন হতে পারে।

দুই) পকসো আইনের অধীন নির্যাতিত শিশুকে সহায়ক ব্যক্তির ব্যবস্থা করতে হবে শিশু কল্যাণ সমিতিতে।

তিন) পকসো আইন অনুযায়ী জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ড শিশুবান্ধব পদ্ধতি গ্রহণ করবে শিশুটির সুরক্ষা নিশ্চিত করতে।

চার) পকসো আইনের অধীন জুভেনাইল জাস্টিস কর্তৃপক্ষের ভূমিকা।

পাঁচ) বয়স নির্ধারণ।

ছয়) আইনি সহায়তা।



শেখার অধিকার - শিখছেটা কি?

আশিস কুমার রায়*

শিখছেটা কি? প্রশ্নটা বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার চারপাশে ঘোরাঘুরি করা আর পাঁচটা শব্দের মধ্যে আমার মতে, অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শব্দ। স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের দেশের প্রাথমিক এবং প্রাথমিকের পরবর্তী ধাপ - উচ্চ-প্রাথমিক শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠা দেবার জন্য নানা ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে - যদিও সেগুলির রাজনৈতিক সদিচ্ছা সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কিন্তু অত্যন্ত সত্য হলেও এটাই বাস্তব যে, ১৯৫০ সালে দাঁড়িয়ে আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে যে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য স্থির করেছিলাম তার ধারে কাছেও পৌঁছাতে সক্ষম হইনি - আর তাই হয়তো ২০১৮, প্রায় ৬৮-৬৯ বছর পর আবার আমাদের “সমগ্র শিক্ষা অভিযান” এর সূচনা করতে হয়।

প্রশ্নটা হল “বীনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষা আইনে” সুপরিকল্পিতভাবে প্রাক-প্রাথমিককে বাদে খাতায় রেখে দেওয়া হল। অথচ সারা পৃথিবীর দিকে তাকালে দেখা যাবে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষাক্ষেত্রে বিনিয়োগের একটা বড় অংশ তার জন্য বরাদ্দ।

জীবনে প্রথম ধাপেই ধাক্কা - শেখা হল না কিছু - এবং আমরা সুযোগ তৈরি করে দিতে ব্যর্থ হলাম - বা অন্যদিকে বলা উচিত এই বয়সীদের “শিক্ষার অধিকার” সুনিশ্চিত করতে পারলাম না। কাজেই এক প্রকার কিছু না শিখেই - আমাদের দেশের অধিকাংশ ছেলে/মেয়ে, মূলত যারা সরকারি ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভরশীল - তারা প্রাথমিক শিক্ষার সাথে যুক্ত হয়। আর বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষার হাল হকিকৎ সম্পর্কে আমাদের সকলেরই ধারণা খুবই পরিষ্কার। পঞ্চম শ্রেণীতে পাঠরত বেশিরভাগ ছাত্র/ছাত্রী দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ পড়তে অক্ষম। যদিও শেখার সারগী অনুযায়ী আমরা আশা করে থাকি যে তারা সবাই তাদের নিজ নিজ পাঠ পড়তে সক্ষম হবে এবং কাঙ্ক্ষিত সামর্থ্য লাভ করবে। কিন্তু বাস্তব চিত্র তার ঠিক উল্টো। আমরা যদি আজ থেকে গত দশ বছরের পরিসংখ্যান বিচার করে দেখি - তাহলে দেখবো যে সকল ছাত্র-ছাত্রী গত দশ বছর পূর্বে তাদের প্রাথমিক শিক্ষার যাত্রা শুরু করেছিল তাদের একটা বড় অংশ মাধ্যমিক স্তরে পৌঁছাবার পূর্বেই বিদ্যালয় ছুটি হয়েছে। আর এই বিদ্যালয়ের গণ্ডির বাইরে চলে যাওয়ার অন্যতম কারণ হল “শিখছে না”।

সারা বছরে দু-শ দিনের ও বেশি বিদ্যালয়ে উপস্থিত থেকেও কিছুই শেখা হচ্ছে না - কাজেই পরবর্তী শ্রেণীতে পৌঁছে শুধুই নানা ধরনের বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আর তাই ধীরে ধীরে পিছিয়ে পড়তে পড়তে - একদিন বিদ্যালয়ের বাইরে যেতে বাধ্য হচ্ছে - বেশ কিছু সংখ্যক পড়ুয়া। এই পড়ুয়ারা মূলত সমাজের মূলস্রোত থেকে সামান্য হলেও পিছিয়ে যাওয়া বা পিছিয়ে থাকা অংশের থেকেই বেশি। কাজেই সকলে মিলে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য - ছোঁয়ার ক্ষেত্রটিকে আরো দূরে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে - কারণ “উন্নয়ন” শব্দটির সাথে “সামগ্রিক” শব্দটির নিবিড় সম্পর্ক।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা অনেকটাই “পরীক্ষা ব্যবস্থা”য় পরিণত হয়েছে - কি শিখছে না দেখে কতটা নম্বর দেওয়া যায় আমরা তা নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। যাতে প্রমাণ করা যেতে পারে - ছাত্র/ছাত্রীরা অনেক শিখছে। প্রাথমিক স্তর থেকে মহাবিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরোনোর পরেও পরীক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে

- ছাত্র/ছাত্রীদের যার বেশির ভাগটাই “কি শিখেছি” - এটা প্রমাণ দেবার কিছু থাকছে না - জানতেও চাইছেন না কেউ। শুধু ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সম্মক জ্ঞান আর অভ্যাস পৌঁছে দিতে পারে শীর্ষে - যার সাথে সত্যিই কি শিখছে তা জানার কোনও উপায় নেই।

কাজেই কি শিখছে - আমাদের ছেলে-মেয়েরা তা দেখার দ্বায়িত্বটা আমাদের নিতেই হবে। বারে বারে এই প্রশ্নটা আমাদের করতে হবে - “শিখছে টা কি?” আর “কেন শিখতে পারছে না”।

নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা গবেষণার ফলাফল আমাদের কাছে আছে অনেক অনেক কারণ জানা সত্ত্বেও আমরা “শেখা”টা সুনিশ্চিত করতে পারছি না। আর পরিণতি খুব ভয়ঙ্কর। জাতীয় স্তরে এবং রাজ্যস্তরে নানা রকম ব্যবস্থাপনার সাথে “শিখছেটা কি” - দেখার স্বচ্ছ ও সরল পদ্ধতি যুক্ত করতে হবে। যাতে সত্যি করে “শিখছেটা কি” জানা এবং তার ফলাফলের উপর দাঁড়িয়ে পরিকল্পনা নেওয়া সম্ভব হয়। একজন শিক্ষক শুধু একজন শিক্ষক/শিক্ষিকা ইচ্ছা করলে পারেন তার নিজের বিদ্যালয়ের সামগ্রিক চিত্রটার পরিবর্তন ঘটাতে - যার অন্যতম হল “শিখছেটা কি”? তা দেখা এবং শেখান।

কাজেই শিক্ষক/শিক্ষিকাদের “পড়ানোর কাজটা” আরো ভাল ভাবে করতে হবে এবং যারা তাঁদের দায়িত্বে আছেন তাদেরও দেখতে হবে শিশুরা যেন “পড়তে” পারেন। অনেক শিক্ষকের অভিযোগ তারা পড়াতে সময় পাচ্ছেন না।

আর বিদ্যালয়ের সাথে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে যুক্ত সকলকে এগিয়ে আসতে হবে - যাতে এটা সুনিশ্চিত করা সম্ভব হয়। শুধুমাত্র সরকার বা সরকারি ব্যবস্থাপনাকে দোষ দিয়ে দায়িত্ব এড়িয়ে গেলে হবে না। আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্বের মধ্যে এটা পড়ে।

বিদ্যালয়ে রঙ হোক, সাজানো হোক - আরও অনেক অনেক নতুন নতুন উদ্যোগ নেওয়া হোক - কিন্তু আমরা যেন ভুলে না যাই বিদ্যালয়ের প্রধান কাজ ছাত্র-ছাত্রীদের শেখানো আর শিখতে সাহায্য করা। শেখার পরিবেশ সুনিশ্চিত করা।

যে মূল্যে আমরা সকলে মিলে “শেখা” টা সুনিশ্চিত করতে পারবো - সাথে সাথেই অন্যান্য বিষয়গুলিও নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

সমগ্র শিক্ষা অভিযান, শিক্ষা আইনের সাথে সাথে শেখার অধিকারকে জায়গা করে দিতে হবে। একমাত্র “শিখতে পারলে” আর “শেখাতে পারলে” সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব। তারজন্য দরকার হলে আমাদেরও তৈরি হতে হবে। শিশুরা শিখতে না পারলে - শেখার ইচ্ছা প্রমাণ করবে না। কীভাবে শেখাবো - এটা আমাদের শেখা দরকার।

"If a child can't learn the way we teach, may be we should teach the way they learn"

(Lgnacio Estrada)

*(আন্তর্জাতিক শিশু-সুরক্ষা নিয়ে কর্মরত সংস্থার সাথে যুক্ত)

শিক্ষার মান, পুষ্টি...

৫ পাতার শেখাংশ ...

শিক্ষিকার দায়বদ্ধতা থাকবে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রতি, কিন্তু সেই শিক্ষিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার সময় ছুটি নিয়ে ঘরে বসে থাকলে যাদের জন্য তিনি শিক্ষকতার কাজে এসেছেন তাদের কি হবে? এ সমস্যায় এখন বিদ্যালয়গুলির অবস্থা শোচনীয়। অবশ্য দোষ তাঁদের নয় - তাঁরা বলবেন, সরকারি ব্যবস্থায় আমাদের ছুটি দেওয়া হচ্ছে, নেব না কেন? বিষয়টি ভাববার আছে। অথচ কেন্দ্রীয় সংস্থায় যাঁরা ৮ ঘন্টা ডিউটি করেন (২৪ ঘন্টা যে ডিপার্টমেন্ট চলে) সেখানে সি সি এল অনুমোদন করা হয় না বললেই চলে। কারণ সেখানে ছুটির আগে প্রতিষ্ঠান, তাই ওই ছুটি আদায় করা সহজ নয়, কারণ খোদ ডিভিশনে প্রধান কার্যালয় থেকে অনুমোদন নিতে হয়। আর বিদ্যালয়গুলিতে

বিশেষ করে বাড়ির কাছাকাছি স্কুলে ৪/৫ ঘন্টা সময়ে কাজ করেও অতিরিক্ত ৪৫ দিন ছুটি নিয়ে অপব্যবহার করার সুযোগ রয়েছে এবং হচ্ছেও। উপযুক্ত কাগজপত্র না নিয়েই প্রধান শিক্ষককে সি সি এল লিভের জন্য উপর মহলে সুপারিশ করতে হয়, না হলে সেই শিক্ষিকা বা তাঁর গোষ্ঠী প্রধান শিক্ষককে ঝামেলায় ফেলবেন।

অথচ বেসরকারি বিদ্যালয়গুলিতে এত ছুটি নেই। মিড-ডে মিল নেই, বড়ি খাওয়ানো নেই - সেখানে শুধু নিয়ম ধরে পঠন-পাঠন। তাই যে সকল অভিভাবকদের একটু সামর্থ্য আছে তাঁরা বেসরকারি বিদ্যালয়ের দিকেই ঝুঁকবেন একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। যত দিন যাবে সরকার পোষিত বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষাবহির্ভূত কাজ বাড়বে, শিক্ষকদের সেই কাজে জড়িয়ে যেতে হবে। কারণ ওইগুলি না হলে কর্তৃপক্ষের চোখ রাঙানি কে সহ্য করবেন। এ অবস্থার পরিবর্তন না হলে শিক্ষার মান বাড়ার সত্যিই কল্পার বিষয়।

ওয়েবস্ট বেস্টল এডুকেশন নেটওয়ার্ক-এর রাজ্য কমিটির পক্ষে স্বপন পণ্ডা কর্তৃক ৬০এ/২ ব্যানার্জী পাড়া লেন, ঢাকুরিয়া, কলিকাতা-৭০০০৩১ হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

দূরভাষ: ০৩৩-২৪০৫ ৫৩৩৪, ই-মেল: wbenwb@gmail.com, ওয়েবসাইট: wben.info মুদ্রণ: শান্তি মুদ্রণ, ৩২/৩ পটুয়াতলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯, দূরভাষ: ২২৪১ ৯৬৩৩ অনুদান: ৬ টাকা

কেবলমাত্র সভ্য ও সমর্থকদের মধ্যে বিতরণের জন্য